بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ জুলাই, ২০২২ মোতাবেক ০৮ ওফা, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিলো সে সম্পর্কে কথা চলছিল। এ ধারাবাহিকতায় এগারোতম অভিযান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অভিযানটি ছিল মুহাজির বিন আবু উমাইয়্যার ইয়েমেন-এর বিদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত (অভিযান)। হযরত আবু বকর (রা.) একটি পতাকা **হযরত মুহাজির বিন উমাইয়্যাকে** প্রদান করেছিলেন আর তাকে তিনি আসওয়াদ আনসির সেনাদলের মোকাবিলা করার এবং **আবনা**'দের সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাদের সাথে কায়েস বিন মাকশূহ্ এবং অন্যান্য ইয়েমেনবাসীরা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সে সময়ে ইয়েমেনে দু'টি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী ছিল, একটি হলো সেখানকার আদিবাসী, যাদের সম্পর্ক ছিল সাবাহ্ এবং হিমইয়ার এর বংশের সাথে। আর দ্বিতীয়টি হলো, পারস্যের আবা-এর বংশধর, যাদেরকে **আবনা** বলা হতো। আবনা-রা সে সময়ে ইয়েমেনের সবচেয়ে শক্তিশালী সংখ্যালঘু ছিল। দীর্ঘ সময় থেকে ইয়েমেন এর শাসক পারস্য সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। এ কারণে সরকারী অধিকাংশ পদ আবনাদের হাতে ছিল। যাহোক, লিখিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মুহাজিরকে নির্দেশ দেন যে, এখানকার অভিযান শেষ করে কিন্দা গোত্রের মোকাবিলার জন্য **'হাযার মওত'** চলে যাবে। 'হাযার মওত' ইয়েমেনের পূর্ব দিকে একটি বিস্তৃত অঞ্চল যেখানে বহু জনপদ রয়েছে। 'হাযার মওত' ও 'সান'র দূরত্ব হলো ২১৬ মাইল। কিন্দা ইয়েমেনের একটি গোত্রের নাম। হযরত মুহাজির (রা.)'র পরিচিতি সম্পর্কে লেখা আছে যে, তার নাম ছিল মুহাজির বিন আবু উমাইয়্যা বিন মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ্। হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়্যা, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)'র ভাই ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি মুশরিকদের পক্ষ হতে অংশ গ্রহণ করেন এবং সেদিন তার দু'ভাই হিশাম এবং মাসঊদ নিহত হয়। তার প্রকৃত নাম ছিল ওয়ালীদ, যেটিকে মহানবী (সা.) পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাজির তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। মহানবী (সা.) যখন উক্ত যুদ্ধ হতে ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। একদিন হযরত উম্মে সালমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনি (রা.) নিবেদন করেন যে, কোন কিছু আমাকে কীভাবে কল্যাণ পৌঁছাতে পারে যখনকিনা আপনি আমার ভাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। হযরত উম্মে সালমা (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর মাঝে কিছুটা নম্রতা ও স্নেহের প্রকাশ দেখতে পান তখন তিনি (রা.) তার সেবিকাকে ইশারা করেন আর সে মুহাজিরকে ডেকে আনে। মুহাজির বারবার নিজের (মদীনায় অবস্থানের) কারণ ব্যাখ্যা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মহানবী (সা.) তার অজুহাত মেনে নেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হন আর তাকে 'কিন্দা'র শাসক নিযুক্ত করেন। তবে অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে তিনি সেখানে যেতে পারেন নি। তখন তিনি যিয়াদকে লিখেন যে, তিনি যেন তার পক্ষ হতে তার দায়িত্বও পালন করেন। এরপর তিনি যখন সুস্থ হয়ে উঠেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে তার এমারতের দায়িত্বে বহাল রাখেন এবং তাকে নাজরান হতে ইয়েমেন-এর শেষ সীমানা পর্যন্ত অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন এবং যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

যাহাক বিন ফিরোয বর্ণনা করেন যে, ইয়েমেনে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ মহানবী (সা.)-এর যুগেই দেখা দেয়, যার নেতা ছিল, **যুল খিমার আবহালা বিন কা'ব**, যে আসওয়াদ আনসী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আসওয়াদ আনসী, ইয়েমেন-এর বনু আনস গোত্রের সর্দার ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার কারণে তাকে আসওয়াদ বলা হতো। এক রেওয়ায়েতে তার নাম **আবহালা বিন কা'ব** এর পরিবর্তে **এ্যায়হালা বিন কা'ব বিন অওফ আনসী** বর্ণিত হয়েছে। আসওয়াদ আনসীর উপাধি ছিল **যুল খিমার**, কেননা সে সব সময় কাপড় জড়িয়ে রাখতো। আর কারও কারও মতে তার উপাধি ছিল, **যুল খুমার** অর্থাৎ, সর্বদা নেশায় মত্ত বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। কতিপয় রেওয়ায়েতে তার উপাধি **যুল হিমার**ও বলা হয়ে থাকে এবং এর একটি কারণ এটি বলা হয় যে, আসওয়াদের কাছে একটি পোষমানা গাধা ছিল; সে যখন সেটিকে বলতো, তোমার মনীবকে সিজদা কর, তখন সেটি সিজদা করতো, বসতে বললে বসতো, দাঁড়াতে বললে দাঁড়িয়ে যেতো। কারও কারও মতে তাকে **যুল-হিমার** বলার কারণ হলো, সে বলতো, আমার কাছে যেই সত্তা প্রকাশিত হন তিনি গাধায় চড়ে আসেন। যাহোক, লিখিত আছে যে, আসওয়াদ **'রহমানুল ইয়েমেন'** উপাধি অবলম্বন করেছিল যেভাবে মুসায়লামা নিজের জন্য **'রহমানুল ইয়ামামা'** উপাধি অবলম্বন করেছিল। সে এ-ও বলে যে, তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় এবং সে শত্রুদের সব পরিকল্পনা পূর্বেই জেনে যায়। আসওয়াদ ছিল একজন ভেলকিবাজ এবং সে মানুষজনকে আশ্চর্য সব ভেলকি দেখাতো। বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, দু'জন নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীকারকের আবির্ভাব হবে। অতএব, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে,

"ক্বালা রসূলুল্লাহ্ বায়না আনা নায়েমুন, উতীতু বেখাযায়েনেল আরযে, ফা উযেয়া ফী কাফফী সিওয়ারানে মিন যাহাব। ফাকাবুরা আলাইয়্যা। ফাআওহাল্লাহু ইলাইয়্যা আনিনফুখহুমা, ফানাফাখতুহুমা ফাযাহাবা। ফাআউয়ালতুহুমাল কায্যাবায়নিল্লাযিনা আনা বায়নাহুমা, সাহেবা সানাআ ওয়া সাহেবাল ইয়ামামা"

অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেন, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার প্রদান করা হয় এবং আমার হাতে দু'টি স্বর্ণের বালা রাখা হয়। এটি আমার কাছে অসহনীয় লাগে। তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ওহী করেন, আমি যেন সেই দু'টোর ওপর ফুঁ দিই। আমি সেগুলোর ওপর ফুঁ দিলে সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি এর অর্থ করেছি দু'জন মিথ্যাবাদী যাদের মাঝখানে আমি রয়েছি; **সানা'র আসওয়াদ আনসী ও ইয়ামামার মুসায়লামা কাযযাব**।'

বুখারী শরীফেই আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন; আমাকে মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নের কথা বলা হয়। তিনি (সা.) বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন আমাকে দেখানো হয় যে, আমার দুই হাতে দু'টি স্বর্ণের বালা রাখা হয়েছে যেগুলো দেখে আমি বিচলিত হই এবং সেগুলোকে অপছন্দ করি। আমাকে বলা হলে আমি সেই দু'টির ওপর ফুঁ দিই আর সেগুলো উড়ে যায়। (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হয়।) আমি এর ব্যাখ্যা করেছি দু'জন মিথ্যাবাদী, আমার বিরুদ্ধে আবির্ভূত হবে। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ্ বলেন, সেই দু'জনের একজন ছিল আনসী যাকে ইয়েমেনে ফিরোয হত্যা করেছে, আর অপরজন হলো মুসায়লামা কাযযাব। মহানবী (সা.) যখন পারস্য-সম্রাট কিসরাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেন তখন সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে তার অধীনস্থ ইয়েমেনের গভর্নর বাযান, মতান্তরে যার নাম ছিল বাদহান, তাকে নির্দেশ দেন; সে যেন ঐ ব্যক্তিকে অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর মস্তক নিয়ে তার দরবারে আসে। বাযান দু'জনকে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠায়, কিন্তু তিনি (সা.) তাদের বলেন, আমার আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন

যে, তোমাদের সম্রাটকে তার পুত্র **শেরাভিয়া** হত্যা করেছে এবং তার স্থলে নিজে সম্রাট হয়েছে। একই সাথে তিনি (সা.) বাযানকে ইসলামগ্রহণের আহ্বান জানান এবং বলেন, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাকে যথারীতি ইয়েমেনের গভর্নর রাখা হবে। একথা শুনে সেই দুই ব্যক্তি ফিরে গিয়ে বাযানকে সব বৃত্তান্ত জানায় এবং সেই সময়ের মাঝে বাযান এই সংবাদও পায় যে, সত্যিই এরূপ ঘটেছে; পারস্য সম্রাটকে তার পুত্র শেরাভিয়া খুন করেছে এবং তার স্থলে নিজে সম্রাট হয়েছে। বাযান মহানবী (সা.)-এর এই বাণী পূর্ণ হতে দেখে মহানবী (সা.)-এর ইসলামগ্রহণের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তিনি (সা.) তাকে ইয়েমেনের গভর্নর পদে বহাল রাখেন।

এই পত্র ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর বিষয়ে এবং পারস্য সম্রাট যা বলেছিল সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও একস্থানে লিখেছেন,

আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা.) বলেন, আমি যখন পারস্য সম্রাটের দরবারে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করি তখন আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয়। আমি যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মহানবী (সা.)-এর পত্র পারস্য সম্রাটের হাতে দেই তখন সে পত্রটি দোভাষীকে পড়ে শোনাতে আদেশ দেয়। দোভাষী যখন উক্ত পত্রের অনুবাদ পড়ে শোনায় তখন পারস্য সম্রাট ক্রোধে পত্রটি ছিঁড়ে ফেলে। আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা.) যখন ফিরে এসে এই বৃত্তান্ত মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমাদের পত্রের সাথে পারস্য সম্রাট যে আচরণ করেছে, খোদা তা'লা তার রাজত্বের সাথেও এমনই করবেন। পারস্য সম্রাটের এহেন আচরণের কারণ হলো, আরবের ইহুদীরা, ঐ ইহুদীদের মাধ্যমে যারা রোম থেকে পালিয়ে ইরানী সাম্রাজ্যে চলে গিয়েছিল আর রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে পারস্য সম্রাটের সঙ্গ দিয়েছিল, ফলে পারস্য সম্রাটের প্রিয়ভাজনে পরিণত হয়। তারা পারস্য সম্রাটকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অনেক উত্তেজিত করে রেখেছিল। তারা যেসব অভিযোগ করছিল, পারস্য সম্রাটের ধারণায় সেই পত্রটি তাদের কথার সত্যায়ন করেছে আর সে ভাবল যে, এই ব্যক্তি [তথা হযরত মুহাম্মদ (সা.)] আমার রাজত্বের প্রতি কুনজর রাখে। তাই সেই পত্র প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই পারস্য সম্রাট তার ইয়েমেনের গভর্নরকে একটি পত্র প্রেরণ করে যার বিষয়বস্তু ছিল এমন যে, কুরাইশের এক ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করেছে এবং এক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করছে। দ্রুত তার কাছে দু'জন ব্যক্তিকে প্রেরণ কর যারা তাকে [তথা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে] আমার কাছে ধরে নিয়ে আসবে। তখন পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে ইয়েমেনের গভর্নর বাযান এক অশ্বারোহীর সাথে এক সেনা কর্মকর্তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে এবং মহানবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে একটি পত্রও প্রেরণ করে (যার বিষয়বস্তু হলো) এই পত্র পাওয়ামাত্র এদের সাথে পারস্য সম্রাটের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হবেন। সেই অফিসার প্রথমে মক্কায় যায়। তায়েফের উপকণ্ঠে এসে সে জানতে পারে যে, তিনি (সা.) মদীনায় বসবাস করেন। অতএব, সে সেখান থেকে মদীনায় যায়। মদীনায় এসে সে মহানবী (সা.)-কে বলে যে, ইয়েমেনের গভর্নর বাযানকে পারস্য সম্রাট আদেশ দিয়েছে যে, আপনাকে গ্রেফতার করে যেন তার দরবারে উপস্থিত করা হয়। আপনি যদি এই আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান তাহলে সে আপনাকেও হত্যা করবে আর আপনার জাতিকেও ধ্বংস করবে এবং আপনার দেশকে ধ্বংস করে ছাড়বে। তাই আপনি অনুগ্রহকরে আমাদের সাথে চলুন। মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বলেন, আচ্ছা! তোমরা আগামীকাল আমার সাথে এসে সাক্ষাৎ করো। রাতে মহানবী (সা.) দোয়া করেন এবং মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্ তাঁকে সংবাদ দেন যে, পারস্য সম্রাটের এই দুরাচরণের শাস্তি হিসেবে আমরা তার পুত্রকে তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। এ বছরই জমাদিউল উলা'র দশ তারিখ সোমবার সে তাকে হত্যা করবে। অন্য কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) বলেন, আজ রাতে তার পুত্র তাকে হত্যা করেছে। হতে পারে সেই রাতই ১০ই

জমাদিউল উলা'র রাত ছিল। সকাল হলে মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে ডেকে আনান আর তাদেরকে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে অবগত করেন। এরপর মহানবী (সা.) বাযানের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করেন যে, খোদা তা'লা আমাকে জানিয়েছেন, পারস্য সম্রাট অমুক মাসের অমুক দিন নিহত হবে। এই পত্র যখন ইয়েমেনের গভর্নরের হস্তগত হয় তখন সে বলে, ইনি সত্য নবী হলে এমনই ঘটবে অন্যথায় তাঁর এবং তাঁর দেশের খবর আছে। অল্প কিছুদিন পর ইরানের একটি জাহায ইয়েমেনের বন্দরে এসে ভিড়ে আর গভর্নরকে ইরানের বাদশাহ্র একটি পত্র দেয় যার সিল মোহর দেখতেই ইয়েমেনের গভর্নর বলে ওঠে– মদীনার নবী সত্য বলেছিলেন। ইরানের সম্রাট পরিবর্তন হয়েছে আর এই পত্রে ভিন্ন এক সম্রাটের সিল মোহর। সে যখন এই পত্র খোলে তখন সেখানে লেখা ছিল, ইয়েমেনের গভর্নর বাযানের প্রতি ইরানের শিরাওয়ায়েহ্ (Chosroes Shirawaih)-এর পক্ষ থেকে এই পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে যে, আমি সাবেক পারস্য সম্রাট তথা আমার পিতাকে হত্যা করেছি, কারণ সে নিজ দেশে রক্তপাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, দেশের ভদ্রচেতা লোকদেরকে হত্যা করতো এবং প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাতো। আমার এই পত্র পাওয়া মাত্রই তুমি সকল অফিসারের কাছ থেকে আমার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিবে। ইতোপূর্বে আমার পিতা আরবের এক নবীকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছিল সেটাকে রহিত জ্ঞান করো। এই পত্র পেয়ে বাযান এতই প্রভাবিত হয় যে, সে এবং তার সঙ্গী তখনই ইসলাম গ্রহণ করে এবং মহানবী (সা.)-কে নিজেদের ইসলামগ্রহণের সংবাদ পাঠায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআনে এভাবে এর বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন। বাযানের মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) নিজের আমীরদের ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। মুআ'য বিন জাবাল ইয়েমেন ও হাযার মওতের এসব এলাকার মুয়াল্লিম (বা শিক্ষক) ছিলেন। সেজন্য তিনি এসব এলাকা পরিদর্শন করতেন। আসওয়াদ একজন গণক ছিল আর সে ইয়েমেনের দক্ষিণে বসবাস করতো। সে ভেলকিবাজি এবং ছন্দবদ্ধ বাক্য দ্বারা লোকদের মনোযোগ খুব দ্রুত নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতো। সে নবুওয়্যতের দাবী করে বসে। সে লোকদেরকে এমন ধারণা দিত যে, তার কাছে একজন ফিরিশ্‌তা আসে যে তাকে সব কিছু বলে দেয় এবং তার শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও রহস্য উদ্‌ঘাটন করে। এতে সরল ও অজ্ঞ লোকদের বড় একটি সংখ্যা তার অনুগামী হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আসওয়াদ আনসী এই স্লোগানের প্রচলন করে যে, ইয়েমেন শুধু ইয়েমেনবাসীদের জন্য। ইয়েমেনের অধিবাসীরা জাতীয়তাবাদের এই স্লোগানেও খুব প্রভাবিত হয়। এই স্লোগান অনেক প্রাচীন, আজও এটিই ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে যে বিশৃঙ্খলা বিরাজমান সেটাও এ কারণেই। যেহেতু ইয়েমেনের অধিবাসীদের মাঝে তখনও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় নি সেজন্য তারা বিদেশী সরকারের আধিপত্য থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য আসওয়াদের জাতীয়তাবাদের স্লোগানে সাড়া দেয় এবং তার সাথে যোগ দেয়। যখন এ বিপজ্জনক সংবাদ মদীনায় পৌঁছায় তখন মহানবী (সা.) মুতা যুদ্ধের শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং উত্তর দিকের আক্রমণ প্রতিহত করতে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)'র সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন তখন তিনি (সা.) ইয়েমেনের কর্মকর্তাদের বার্তা পাঠান তারা যেন নিজেদের মতো করে আসওয়াদের মোকাবিলা করা অব্যাহত রাখেন, হযরত উসামার সেনাবাহিনী বিজয়ী বেশে ফেরত আসামাত্রই তাদেরকে ইয়েমেনে প্রেরণ করা হবে। আসওয়াদ আনসী বড় একটি সেনাদল প্রস্তুত করেছিল। তার সেনাদলে উটের আরোহী ছাড়াও সাতশ' অশ্বারোহী ছিল। পরবর্তীতে তার ক্ষমতা আরো দৃঢ় হতে থাকে। **মুযহাজ** গোত্রে তার স্থলাভিষিক্ত ছিল **আমর বিন মা'দী কারেব**। আমর বিন মাদী কারেব ইয়েমেনের বিখ্যাত অশ্বারোহী, কবি ও বক্তা ছিল। তার ডাকনাম **আবু সওর** ছিল। দশম হিজরীতে সে নিজ গোত্র **বনু যাবীদ-এর** প্রতিনিধিদলের সাথে মহানবী (সা.)-এর সকাশে

উপস্থিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরে মুরতাদ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং **কাদসিয়ার** যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতের শেষদিকে তার মৃত্যু হয়। লিখা রয়েছে, আসওয়াদ আনসী প্রথমে নাজরানের অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ করে **হযরত আমর বিন হাযাম** ও **হযরত খালেদ বিন সাঈদকে** সেখান থেকে বহিষ্কার করে। এরপর সে সানা'তে আক্রমণ করে সেখানে **হযরত শাহার বিন বাযান** তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কিন্তু তিনি শহীদ হয়ে যান। হযরত মুআ'য বিন জাবাল সে দিনগুলোতে সানা'তে ছিলেন কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি **মুআরেবে হযরত আবু মূসার** কাছে চলে যান। সেখান থেকে তারা উভয়ে হাযার মওত চলে যান। এভাবে আসওয়াদ আনসী ইয়েমেনের অধিকাংশ এলাকা করতলগত করে। আসওয়াদ আনসী হযরত শাহার বিন বাযানকে শহীদ করার পরে তার স্ত্রী, যার নাম ছিল **মারযুবানা** অথবা কোন কোন পুস্তক অনুসারে **আযাদ** ছিল তাকে জোর করে বিয়ে করে। এরইমাঝে ইয়েমেন এবং হাযার মওতের অধিবাসীদের নিকট মহানবী (সা.)-এর পত্র পৌঁছায় যেটিতে তাদেরকে আসওয়াদ আনসীর সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ উদ্দেশ্যে হযরত মুআয বিন জাবাল দণ্ডায়মান হন আর এতে মুসলমানদের মনোবল দৃঢ় হয়। জিশনাস দেলমী বলেন, ওয়াবার বিন ইউহান্নেস নামক এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর পত্র নিয়ে আমাদের কাছে আসেন। **জিশনাস দেলমী**র নাম কোন কোন স্থানে **জুশায়শ দেলমী**ও লেখা হয়েছে। যাহোক, ইনি সেসব লোকের একজন ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) ইয়েমেনে আসওয়াদ আনসী-কে হত্যা করার জন্য পত্র লিখেছিলেন আর তিনি ফিরোয এবং **দাযোভিয়াহ্**'র সাথে মিলে তাকে হত্যা করেছিলেন। **ওয়াবার বিন ইউহান্নেস**-এর নাম **ওয়াব্রা বিন ইউহান্নেস**ও বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইয়েমেনের **আবনা** (জাতির সদস্য) ছিলেন। তিনি দশম হিজরীতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, এই পত্রে মহানবী (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমরা যেন নিজ ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং যুদ্ধ কিংবা কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে আসওয়াদ আনসীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এছাড়া আমরা যেন তাঁর (সা.) বার্তা সেসব লোকের নিকট পৌঁছে দেই যারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মের সাহায্যার্থে প্রস্তুত। আমরা (সে অনুযায়ী) কাজ করি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে, আসওয়াদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করা দুঃসাধ্য। জিশনাস দেলমী বর্ণনা করেন, আমরা একটি বিষয় অবগত হই যে, **আসওয়াদ** এবং **কায়েস বিন আবদে ইয়াগুসের** মধ্যে কিছুটা কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মাঝে অনৈক্য অথবা অল্পবিস্তর মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমরা চিন্তা করলাম, কায়েস নিজের জীবনের বিষয়ে আশংকা বোধ করে। কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস-এর নাম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একটি ভাষ্যমতে, তার নাম **হুবায়রাহ্ বিন আবদে ইয়াগুস** ছিল এবং এটিও বলা হয় যে, তার নাম **আবদে ইয়াগুস বিন হুবায়রাহ্** ছিল। যাহোক, আবু মূসা'র ভাষ্য মতে তার নাম ছিল, কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস বিন মাকশুহ্। এক বর্ণনামতে তিনি সাহাবী ছিলেন না কিন্তু অপর বর্ণনামতে, মহানবী (সা.)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ (হয়েছিল) এবং তাঁর (সা.)-এর বরাতে (কিছু) রেওয়ায়েত করার সম্মান লাভ করেছেন। তিনি আসওয়াদ আনসী'র হন্তারকদের একজন ছিলেন এবং আমর বিন মাদী কারেব-এর ভাগিনা ছিলেন। তিনি ইয়েমেনে মুরতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু পরে আবার ইসলামে ফিরে আসেন। ইরাক বিজয় এবং কাদসিয়া'র যুদ্ধে উল্লেখযোগ্যরূপে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি **নিহাওয়ান্দ**-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং **সিফ্ফীন**-এর যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)'র সহযোদ্ধা হিসেবে শহীদ হন। জিশনাস দেলমী বলেন, আমরা কায়েস'কে ইসলামের দাওয়াত দেই এবং তার কাছে মহানবী (সা.)-এর বাণী পৌঁছালে তার এমন মনে হয়, আমরা যেন আকাশ থেকে অবতরণ করেছি। তাই ত্বরিৎ সে আমাদের কথা

মেনে নেয় আর একইভাবে অন্যদের সাথেও আমরা পত্র বিনিময় করি। বিভিন্ন গোত্রপতিও আসওয়াদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা পত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়, (যার) উত্তরে আমরা লিখেছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের উত্তর না দেই ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যেন নিজ স্থান থেকে অগ্রসর না হয় কেননা, মহানবী (সা.)-এর বার্তা পাওয়ার পর আসওয়াদ-এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। একইভাবে মহানবী (সা.) নাজরানের সকল অধিবাসীকেও আসওয়াদের বিষয় সম্পর্কে লিখেছিলেন। তারাও মহানবী (সা.)-এর কথা মেনে নেয়। এই সংবাদ যখন আসওয়াদ-এর কানে পৌঁছায় তখন সে নিজের ধ্বংস দেখতে পায়। জিশনাস দেলমী বলেন, আমার (মাথায়) একটি পরিকল্পনা আসে এবং আমি আসওয়াদের স্ত্রী **আযাদ**-এর কাছে যাই যে **শাহর বিন বাযান**-এর বিধবা স্ত্রী ছিল। আর শাহর বিন বাযান'কে হত্যা করার পর আসওয়াদ তাকে বিয়ে করেছিল। আমি তাকে আসওয়াদ-এর হাতে তার প্রথম স্বামী হযরত শাহর বিন বাযানের শাহাদত ও তার বংশের অন্যান্য সদস্যের মৃত্যু এবং তার পরিবার যেসব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও যুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছিল তা স্মরণ করাই আর আসওয়াদ-এর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করি। তখন সে সানন্দে সম্মত হয় আর বলে, খোদার কসম! আমি আসওয়াদ-কে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করি। সে আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা করে না এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ কোন বস্তুকে পরিহার করে না। কাজেই, তোমরা যখনই চাইবে আমাকে জানিও আমি এ বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। পরিশেষে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে আসওয়াদ-এর স্ত্রীর সাহায্যে এক রাতে তার প্রাসাদে ঢুকে আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করা হয়।

সকাল হলে দুর্গের দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যতিক্রমধর্মী আওয়াজ উত্তোলন করা হয় যে, ধর্মত্যাগী বিদ্রোহী আসওয়াদ তার অশুভ পরিণামে পৌঁছে গেছে; তখন মুসলমান ও কাফিররা দুর্গের চতুর্দিকে সমবেত হয়। এরপর তারা ফজরের আযান দেয় এবং বলে, **আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্** - অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌'র রসূল। আসওয়াদ আনসী মিথ্যাবাদী। এরপর তার মস্তক সেই লোকদের সামনে নিক্ষেপ করেন। এভাবে এই নৈরাজ্য তিন মাস পর্যন্ত এবং অপর এক বর্ণনানুযায়ী প্রায় চার মাস পর্যন্ত অশান্তি ছড়িয়ে প্রশমিত হয়ে যায় এবং সকল কর্মকর্তা ও আমীর প্রমুখগণ নিজ নিজ অঞ্চলে রীতি অনুসারে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন আর হযরত মুআ'য বিন জাবাল তাদের ইমামতি করতেন। আসওয়াদ আনসী'র হত্যা, তার সেনাদলের পরাজয় এবং তার নৈরাজ্য অবসানের সংবাদ মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করার পূর্বেই তিনি (সা.) ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন। এই রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁকে আসওয়াদ আনসী'র হত্যার সংবাদ ওহীর মাধ্যমে সেই রাতেই প্রদান করেছিলেন যে রাতে সে নিহত হয়েছিল। অতএব, তিনি (সা.) পরের দিন সকালে এই সংবাদ সাহাবীদেরও প্রদান করেন এবং একথাও বলেন যে, তাকে ফিরোয হত্যা করেছে। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার পর সর্বপ্রথম প্রাপ্ত সু-সংবাদ ছিল আসওয়াদ আনসী'র নিহত হওয়ার খবর। আসওয়াদের নিহত হওয়ার সংবাদ যে রাতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পৌঁছে (তার) পরের দিন সকালেই তিনি (সা.) ইহধাম ত্যাগ করেন। আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে যখন আসওয়াদের হত্যার সংবাদবাহী মদীনায় পৌঁছে তখন মহানবী (সা.)-কে সমাহিত করা হচ্ছিল। আরেকটি রেওয়ায়েত হলো, আসওয়াদকে হত্যার সংবাদ মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর ১০-১২ দিন পর মদীনায় পৌঁছে যখন হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, কিন্তু এটি সেই দিনগুলোরই ঘটনা। ৮-১০ দিন পূর্বে বা পরের (ঘটনা) হবে। আসওয়াদকে হত্যার পর সানা'য় আগের মতো

মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ইয়েমেনে পুনরায় বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুসংবাদ যখন ইয়েমেনে পৌঁছে তখন শোধরানো অবস্থা পুনরায় বিগড়ে যায়। **কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস**, যে ফিরোয ও বাযোভেহ্'র সঙ্গে মিলিত হয়ে আসওয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং যে তাদের সহযোগিতায় আসওয়াদকে হত্যা করেছিল, পুনরায় ইসলাম ছেড়ে দেয়। সে যোগ্য ও দৃঢ়প্রত্যয়ী ব্যক্তি ছিল, জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল, ইয়েমেনে ইরানীদের ক্ষমতা তার কাছে সবসময় প্রশ্ন হয়ে বিরাজ করতো। তাদের শাসনাবসানের পর সে আবনা'র সমৃদ্ধি ও তাদের সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিকে ধূলিস্মাৎ করতে চাইতো। পূর্বেই সে একজন সফল সামরিক নেতা ছিল; সে আসওয়াদের সামরিক নেতাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এবং আবনাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করে। ফিরোয ও বাযোভেহ্ উভয়ের সাথে সে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলে। বাযোভেহ্-কে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করে আর ফিরোয নিহত হতে হতে বেঁচে যায়। ফিরোয হযরত আবু বকর (রা.)-কে তার ও আবনাদের আনুগত্যের কথা জানিয়ে নিবেদন করেন যে, আমাদের সাহায্য করুন, আমরা ইসলামের খাতিরে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছি। এটি লিখিত আছে যে, মহানবী (সা.) যখন ইহধাম ত্যাগ করেন তখন **হাযার মওত** অঞ্চলে তাঁর (সা.)-এর গভর্নর ছিলেন যিয়াদ বিন লাবীদ। হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন। হযরত যিয়াদ (রা.)'র এক ছেলে ছিলেন আব্দুল্লাহ্। আকাবার দ্বিতীয় বয়'আতের সময় তিনি সত্তরজন সঙ্গীসহ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামগ্রহণের পর মদীনায় ফেরত আসতেই তিনি তার গোত্র বনু **বায়াযাহ্**'র প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলেন, যেসব প্রতিমার তারা উপাসনা করতো। এরপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে মক্কায় চলে যান আর সেখানেই অবস্থান করেন, অবশেষে মহানবী (সা.) মদীনা অভিমুখে হিজরত করলে তিনিও হিজরত করেন। এজন্য হযরত যিয়াদ (রা.)-কে মুহাজির-আনসারী বলা হয়। হিজরতও করেছেন এবং আনসারও ছিলেন। হযরত যিয়াদ (রা.) বদর, উহুদ ও পরীখা সহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। মহানবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর বনু বিয়াযা গোত্রের মহল্লা অতিক্রম করার সময় হযরত যিয়াদ (রা.) তাঁকে স্বাগত জানিয়ে নিজের বাড়িতে অবস্থানের জন্য আমন্ত্রন জানান। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার উটনীকে স্বাধীন ছেড়ে দাও, সে নিজেই গন্তব্য খুঁজে নিবে। নবম হিজরী সনের মহররম মাসে মহানবী (সা.) সদকা ও যাকাত সংগ্রহের জন্য পৃথক পৃথক মুহাচ্ছেল বা সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। তখন তিনি (সা.) হযরত যিয়াদ (রা.)-কে হাযারা মওত অঞ্চলের মুহাচ্ছেল নিযুক্ত করেন। হযরত উমর (রা.)'র যুগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বেই বহাল থাকেন। এই পদ থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি কূফায় বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই তিনি ৪১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর হযরত মুহাজির (রা.)'র নাজরান অভিমুখে যাত্রা করা সম্পর্কে লিখা রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) গঠিত এগারোটি সেনাদলের মধ্যে সবার শেষে হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়্যার সেনাদল মদীনা হতে ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাঁর সাথে মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের একটি দলও ছিল। এই সেনাদলটি পবিত্র মক্কা অতিক্রম করে যাওয়ার সময় **আত্তাব বিন আসীদের** ভাই মক্কার আমীর **খালেদ বিন আসীদ** (রা.)ও তাদের সাথে যুক্ত হন। এই বাহিনী যখন তায়েফ অতিক্রম করে তখন **হযরত আব্দুর রহমান বিন আস** (রা.)ও তার সঙ্গীসাথিসহ এই বাহিনীতে যোগ দেন। অনুরূপভাবে পথিমধ্যে বিভিন্ন গোত্রের লোকও তার সাথে যুক্ত হতে থাকে। ফলে এটি অনেক বড় একটি বাহিনীরূপে সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

আমর বিন মাদী কারেব এবং কায়েস বিন মাকশুর গ্রেফতার হওয়া প্রসঙ্গে লিখা রয়েছে, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমর বিন মাদী কারেব তার সাহসিকতা ও শক্তির অহমিকায় ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল আর কায়েস বিন আব্দে ইয়াগুসকেও সঙ্গী বানিয়ে নিয়েছিল। এরা দুজন প্রত্যেক গোত্রে গিয়ে গিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়ার বিষয়ে প্ররোচিত করেছিল। এর ফলে নাজরানের খ্রিষ্টান অধিবাসীরা ছাড়া, যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এবং হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালেও চুক্তিতে অনড় থাকে, অবশিষ্ট সকল গোত্র আমর বিন মাদী কারেবের সঙ্গ দেয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। খোদার মহিমা! ইয়েমেনের অধিবাসীরা যখন হযরত মুহাজের (রা.)-এর বড় একটি সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে আগমনের সংবাদ পেতে আরম্ভ করে তখন ইয়েমেনের অধিবাসীরা এই উৎকণ্ঠায় পড়ে যায় যে, তারা হযরত মুহাজের (রা.)-এর সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তারা তখনও এমন অবস্থায়ই ছিল, এমতাবস্থায় তাদের নেতা কায়েস এবং আমর বিন মাদী কারেবের মাঝে বিভেদ দেখা দেয়। তাই হযরত মুহাজের (রা.)-এর মোকাবিলা করার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তারা উভয়েই পরস্পরের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে আমর বিন মাদী কারেব মুসলমানদের সাথে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং এক রাতে সে তার লোকজন নিয়ে কায়েসের বসতিস্থলে আক্রমণ করে আর তাকে গ্রেফতার করে হযরত মুহাজের (রা.)-এর নিকট নিয়ে যায়। কিন্তু হযরত মুহাজের (রা.) কেবল কায়েসকে গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং তিনি আমর বিন মাদী কারেবকেও গ্রেফতার করেন এবং এদের দুজনের অবস্থা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে লিখে তাদের উভয়কে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। কায়েস এবং আমর বিন মাদী কারেবকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সামনে আনা হলে তিনি (রা.) কায়েসকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র বান্দাদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন করে তাদেরকে হত্যা করেছ? অপরদিকে তুমি মু'মিনদের বাদ দিয়ে মুশরেক ও মুরতাদ বিদ্রোহীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছ? তার পক্ষ থেকে কোন সুস্পষ্ট অপরাধ পাওয়া গেলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু কায়েস বাযভিয়ার হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তাতে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। এটি এমন একটি হত্যাকাণ্ড ছিল যা গোপনে ঘটানো হয়েছিল আর এ বিষয়ে কায়েসের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাই হযরত আবু বকর (রা.) তাকে হত্যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় জনের পালা এলে হযরত আবু বকর (রা.) আমর বিন মাদী কারেবকে বলেন,

তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তোমরা অহরহ পরাজিত হচ্ছ আর তোমাদের গলার ফাঁস ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। তুমি যদি এই ধর্মের সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। এরপর তিনি (রা.) তাকেও মুক্ত করে দেন আর এই উভয় ব্যক্তিকে, অর্থাৎ আমর ও কায়েসকে তাদের গোত্রের কাছে হস্তান্তর করেন। আমর বলে, অবশ্যই এখন আমি আমীরুল মু'মেনীনের উপদেশ অনুসারে কাজ করব এবং কখনোই আর এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না। সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ না থাকায় আর তারা সরদার হওয়ায় ও তাদের জ্ঞানের কারণে তাদের দুজনকে তিনি ক্ষমা করে দেন।

তাদের ক্ষমার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আরেকজন ঐতিহাসিক হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে লিখেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) অনেক দূরদর্শী ও অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন আর পরিণতির ওপর দৃষ্টি রাখতেন। যেখানে কঠোরতার প্রয়োজন হতো সেখানে কঠোরতা অবলম্বন করতেন আর যেখানে ক্ষমা ও মার্জনা করার প্রয়োজন হতো সেখানে ক্ষমা ও মার্জনা করতেন। বিভিন্ন গোত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকদের তিনি ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত

করার আকাঙ্ক্ষা ও গভীর আগ্রহ রাখতেন। তাঁর এমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল যে, বিরোধী গোত্রগুলোর নেতাদেরকে সত্য তথা ইসলামে ফিরে আসার পর ক্ষমা করে দেয়া উচিত বলে মনে করতেন। ইয়েমেনের মুরতাদ গোত্রগুলোকে অনুগত করার পর তিনি (রা.) যখন তাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যের মাহাত্ম্য ও বিজয় এবং মুসলমানদের সম্মান ও শক্তি আর তাদের সংকল্পের দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন তখন গোত্রগুলো তা মেনে নেয় এবং ইসলামী সরকারের অনুগত হয়ে যায় আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। হযরত আবু বকর (রা.) এসব গোত্রীয় নেতাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সাথে কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা সমীচীন মনে করেন। অতএব তিনি তাদের শাস্তি প্রত্যাহার করে নেন, তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলেন এবং গোত্রগুলোর মাঝে তাদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে সেগুলোকে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করেন। তিনি তাদের দুর্বলতা ক্ষমা করে দেন, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস এবং আমর বিন মাদী কারেবের সাথেও একই ব্যবহার করেন। তারা উভয়েই আরবের সাহসী বীর ও বুদ্ধিমান লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তাদের বিনষ্ট করা আবু বকর (রা.)-এর কাছে সমীচীন মনে হয় নি। তিনি তাদেরকে ইসলামের জন্য বেছে নেয়া এবং ইসলাম ও ধর্মত্যাগের মধ্যবর্তী দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে তাদের বের করার ইচ্ছা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) আমর বিন মাদী কারেবকে মুক্ত করে দেন। সেদিনের পর আমর আর কখনোই মুরতাদ হয় নি, বরং ইসলাম গ্রহণ করে এবং উত্তম মুসলমান হয়ে জীবনযাপন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য করেন আর ইসলামের বিভিন্ন বিজয়ের ক্ষেত্রে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কায়েসও তার কৃতকর্মের কারণে লজ্জিত হয়, ফলে আবু বকর (রা.) তাকেও ক্ষমা করে দেন। আরবের এই দুই যোদ্ধাকে ক্ষমা করার ফলে খুবই সুদূর প্রসারী ফলাফল সামনে আসে। হযরত আবু বকর (রা.) এমনভাবে তাদের মন জয় করেন যে, মুরতাদ হওয়ার পর ভয়ভীতি বা লোভে পড়ে (হোক), তারা ইসলামে ফিরে এসেছে। তিনি আশআস বিন কায়েসকেও ক্ষমা করে দেন। এভাবে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের হৃদয়গুলোকে তাঁর ভালোবাসাপাশে আবদ্ধ করেন এবং সেগুলোর মালিক বনে যান আর ভবিষ্যতে এরা-ই ইসলামের সাহায্য-সমর্থন এবং মুসলমানদের শক্তির মাধ্যমে পরিণত হয়। অর্থাৎ কোন জবরদস্তি ছিল না, বরং মন থেকে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর আনুগত্য করে।

হযরত মুহাজের নাজরান থেকে লাহ্জিয়া অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন আর তাঁর অশ্বারোহীরা তাদেরকে ঘিরে ফেললে তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করে, কিন্তু মুহাজের তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। হযরত মুহাজের (রা.)-এর সাথে তাদের একদলের আজীব নামক স্থানে মোকাবিলা হয়। আজীব ইয়েমেনের একটি স্থানের নাম। হযরত মুহাজের (রা.)-এর অন্য অশ্বারোহীরা হযরত আব্দুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে আখাবেসের পথে তাদের মোকাবিলা করে এবং যে সকল শত্রু পলায়ন করেছিল তাদেরকে প্রতিটি রাস্তায় ধরে ধরে হত্যা করে। ইয়েমেনের আলাব অঞ্চলে বনু আক যখন বিদ্রোহ করে তখন তাদের নাম দেয়া হয় আখাবেস আর যে পথে এসব দুষ্ট প্রকৃতি ও মন্দ স্বভাবের লোকদের সাথে যুদ্ধ হয় সেটিকে পরবর্তীতে তরিকুল আখাবেস নাম দেয়া হয়।

হযরত মুহাজের (রা.)-এর সানআ-য় পৌঁছার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মুহাজের আজীব থেকে যাত্রা করে সানআ-য় পৌঁছার পর পলায়নকারী বিভিন্ন গোত্রের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। মুসলমানরা তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ধরতে পারে তাদেরকে হত্য করে আর কোন বিদ্রোহীকেই ক্ষমা করে নি, তবে অবাধ্যরা ছাড়া যারা তওবা করেছিল তাদের তওবা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, যারা যুদ্ধ করেছিল, অত্যাচার করেছিল তাদেরকে ক্ষমা

করেন নি, কিন্তু বাকিদের ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাদের পূর্বের অবস্থা অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করা হয় আর তাদের পক্ষ থেকে সংশোধনের আশা ছিল। এ বিবরণ এতটুকুই। পরবর্তী বিবরণ একটু দীর্ঘ হওয়ায় (আজ) এখানেই শেষ করছি, বাকিটা ভবিষ্যতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক এর তত্ত্বাবধানে অনূদিত)